লীলা মজুমদার

ছোটদের ভালো ভালো গল্প

ছোটোদের
ভালো ভালো গল্প

সেজোমামার চন্দ্র-যাত্রা

আমার ছোটোকাকা মাঝে মাঝে আমাদের বলেন, 'এই যে তোরা আজকাল চাঁদে যাওয়া নিয়ে এত নাচানাচি করিস, সেকথা শুনলে আমার হাসি পায়। কই, এত খরচাপাতি, খবরের কাগজে লেখালেখি করেও তো শুনলাম না কেউ চাঁদে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে! তোরা আবার এটাকে বৈজ্ঞানিক যুগ বলিস, ছোঃ!'

আমরা তখন বলি, 'তার মানে? কী বলতে চাও খুলে বলো-না।'

ছোটোকাকা বলেন, 'তার মানেটা খুবই সোজা। চাঁদে যাওয়াটা কিছু-একটা তেমন আজকালকার ব্যাপারও নয়। পঞ্চাশ বছর আগে আমি নিজেই তো একরকম বলতে গেলে চাঁদে ঘুরে এসেছি।'

আমরা তো অবাক! 'একরকম বলতে গেলে কী? গেছিলে, না যাওনি?'

ছোটোকাকা বইয়ের পাতার কোনা মুড়ে রেখে পা গুটিয়ে বসে বললেন, 'তাহলে দেখছি সব কথাই খুলে বলতে হয়। বয়স আমার তখন বারো-তেরো হবে, পুজোর ছুটিতে গেলাম মামাবাড়িতে। সেজোমামা অনেক করে লিখেছেন। এমনিতেই আমি কোথাও গেলে সেখানকার লোকরা খুব যে খুশি হয় বলে মনে হয় না, আর সেজোমামা তো নয়ই। তা ছাড়া দিদিমা সারাক্ষণই এটা-ওটা দেন, খাওয়া-দাওয়া ভালো, পুকুরে ছিপ ফেললেই এই মোটা মোটা মাছ, গাছে চড়লেই ডাঁসা পেয়ারা। না যাবার কোনো কারণই ছিল না।

'সেখানে পৌঁছে দেখি সেজোমামা কোত্থেকে একটা লড়ঝড়ে মোটর গাড়ি জোগাড় করে আমাকে নিতে স্টেশনে এসেছেন। আমাকে দেখেই, মাথা থেকে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আগের চেয়ে যেন একটু ভারী-ভারী লাগছে! হ্যাঁরে, তোর ওজন কত রে?'

কিছুদিন আগেই ইস্কুলে সবাইকে ওজন করেছে। বললাম, 'আটত্রিশ সেরের সামান্য বেশি।'

সেজোমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার বেশি কেন? সে যাকগে, ওতেই হবে, এখন গাড়িতে ওঠ, চল তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাই, খুব ভালো খাওয়ায় তারা।'

সেজোমামাকে গাড়ি চালাতে দেখে আমি তো অবাক, 'তুমি আবার গাড়ি চালাতে পার নাকি?'

সেজোমামা বেজায় রেগে গেলেন, 'কী যে বলিস! আরে এই সামান্য একটা গাড়িও চালাতে পারব না? বলে কি না যে আমি— যাকগে, চল তো এখন।'

সোজা নিয়ে গেলেন কুণাল মিত্তিরের রহস্যময় বাড়িতে। ও বাড়ির ভেতরে এখানকার কেউ কখনো যায়নি, কুণাল মিত্তিরের নাম সবাই জানে, তবে তাকে কেউ চোখে দেখেনি। একটা উঁচু টিলার ওপরে অদ্ভুত বাড়ি, বাড়ির চারিদিকে দেড়-মানুষ-উঁচু পাঁচিল, তার ওপরে কাঁটাতারের বেড়া,

দেয়াল কেটে লোহার গেট বসানো, সে সর্বদাই বন্ধ থাকে। শোনা যায় কুণাল মিত্তির নাকি নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, সেসব সাধারণের জন্য নয়, অতি গোপন ও গুহ্যভাবে করতে হয়।

প্রকাণ্ড টিলাটার গা বেয়ে যদি চড়া যায়, ওপরটা চ্যাপটা, সবটা ঘিরে পাঁচিল, আশেপাশে কোনো গাছগাছড়াও নেই যে তাতে চড়ে পাঁচিলের ভেতরে দেখা যাবে কিছু। তার ওপর মাঝে মাঝে ভেতর থেকে বাড়ি-কাঁপানো গর্জন শোনা যায়, লোকে বলে নাকি দু-জোড়া ডালকুত্তা দিনরাত ছাড়া থাকে। মোট কথা, কেউ ওদিকে বড়ো-একটা যায় না। চারিদিকে দু-তিন মাইলের মধ্যে কারো বসতিও নেই। ফাঁকা মাঠ আগাছায় ভরা।

সেইখানে তো গেলেন আমাকে নিয়ে সেজোমামা। আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গাঁ গাঁ করতে করতে গাড়িটা তো টিলার ওপরে চড়ল। তারপর প্যাঁক-প্যাঁক করে হর্ন বাজাতেই লোহার দরজা গেল খুলে। আমরাও ভেতরে গেলাম। অবাক হয়ে দেখি চমৎকার ফুলবাগান, একতলা লম্বা একটি বাড়ি, তার বারান্দায় একটা বড়ো কালো বেড়াল সোজা হয়ে বসে সবুজ চোখ দিয়ে আমাদের দেখছে। একটা উঁচু দাঁড়ে নীল কাকাতুয়াও একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমাদের বলছি কেন, আসলে আমাকে দেখছে।

অমনি চারিদিক থেকে দলে দলে চাকরবাকর ছুটে এসে মহা খাতির করে আমাদের নামাল। বারান্দা থেকে একজন ভদ্রলোকও এগিয়ে এলেন, ফর্সা কোঁকড়া চুল, বেঁটে মোটা, বয়স বেশি নয়। সেজোমামাকে ফিসফিস করে বললাম, 'ওই নাকি সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কুণাল মিত্তির যাকে কেউ চোখে দেখেনি।'

শুনতে পেয়ে ভদ্রলোক চটে গেলেন, 'কেউ চোখে দেখেনি কী, আমি বিলক্ষণ দেখেছি। বিশ্রী দেখতে।'

সেজোমামা বললেন, 'আহা, বড়ো কথা বলিস। ওই তোর দোষ। কিছু মনে কোরো না, মনোহর— উনি কুণাল মিত্তির হতে যাবেন কেন, কুণাল মিত্তির ওঁর বাবা, ওঁর নাম মনোহর মিত্তির, আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। একদিন উনি ওঁর বাবার চেয়েও অনেক বেশি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবেন। জানিস তো, মিত্তিররা কীরকম চালাক হয়।'

মনোহরবাবু তাই শুনে ছোটো গোঁফটাকে একটু নেড়ে বললেন, 'আর তুমিও তার চেয়ে খুব বেশি কম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবে না।— কী যেন নাম তোমার বললে?'

বললাম, 'আগে বলিনি, এখন বলছি— ইন্দ্র।'

খুশি হয়ে বললেন, 'ইন্দ্র? তা ইন্দ্রই বটে, চাঁদের মাটিতে প্রথম পা দেবার গৌরব হবে যার, সে ইন্দ্রের চেয়ে কোন দিক দিয়ে কম বলো দিকিনি।'

চারপাশের লোকজনেরা বলতে লাগল, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

আমার তো চক্ষু ছানাবড়া। চাঁদে যাব নাকি আমি?

বললাম, 'সে আমার যেতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু একা যাব না। তা ছাড়া, আবার ফিরে আসব তো? ডিসেম্বরে আমার ক্রিকেট ম্যাচের সিট বলা আছে কিন্তু।'

সেজোমামা আর মনোহরবাবু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। শেষটা মনোহরবাবু বললেন, 'তা হ্যাঁ— তা ফিরে আসবে বই কী, যাবে আর আসবে না, সে কি একটা কথা হল নাকি! কিন্তু আর দেরি কীসের জন্য? চলো তো দেখি ইন্দ্র, আমার সঙ্গে।'

গেলাম বাগান পেরিয়ে একটা জায়গায়। তার মাথার ওপর দিয়ে লম্বা একটা কী বেরিয়ে রয়েছে, বিকেলের পড়ন্ত রোদে চিকচিক করছে, আগাটা ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে।

বেড়ার দরজা চাবি দিয়ে খুলে মনোহরবাবু সরে দাঁড়ালেন, আমিই আগে ঢুকলাম।

গিয়ে যা দেখলাম সে আর কী বলব। আগাগোড়া অ্যালুমিনিয়ামের মতো কী ধাতু দিয়ে তৈরি কী একটা বিশাল যন্ত্র, অবিকল উড়ুক্কু মাছের মতো দেখতে, তবে ডানাগুলো অনেক ছোটো আর পিছন দিকে বেঁকিয়ে বসানো। দেখলেই বোঝা যায় যে একবার ছেড়ে দিলেই অমনি সুড়ুৎ করে তিরের মতো ওপরে উঠে, নীল আকাশের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবে। চাঁদে যাওয়া এর পক্ষে সেরকম কিছুই শক্ত হবে না।

নীচে একটা গোল প্ল্যাটফর্ম ওটাকে চারিদিকে ঘিরে আছে, সেটাই প্রায় একতলার সমান উঁচু হবে, তারো নীচে যন্ত্রটার আরও অনেকখানি রয়েছে। রুপোলি গায়ে কালো দিয়ে লেখা 'ধূমকেতু'। আর এক জোড়া এই বড়ো বড়ো চোখ আঁকা। আশেপাশে কতরকম যন্ত্র দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা, বোঝা গেল— একবার সেইগুলো খুলে দিলেই আর দেখতে হবে না!

মনোহরবাবু চোখ ছোটো করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পকেটে কী? ওরকম ঝুলে আছে যে? ও হবে না, যতটা সম্ভব হালকা চাওয়া চাই। এই বেদে, দেখ তো ওর পকেটে কী।'

বেদে বলে লোকটা এগিয়ে আসতেই বললাম, 'এই খবরদার, তাহলে কিন্তু চাঁদে যাব না বলে রাখলাম।'

মনোহরবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ও-রকম করিসনে বাপ, চাঁদে যাবি না কী রে? তুই না গেলে কে যাবে বল দিকিনি? কেউ রাজিও হবে না, তা ছাড়া তোর প্যান্টের মাপে সব তৈরি। এখন না গেলে যে আমার জীবনের সব কাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে! বলছি আমার শালাকে বলে তোকে মোহনবাগান ক্লাবের লাইফ মেম্বর করে দেব।'

ওঁর হাত ধরে বললাম, 'দেবে তো ঠিক? বাবা! সেজোমামা কত চেষ্টা করেও হতে পারেনি। শেষটা কিন্তু অন্যরকম বললে—'

মনোহরবাবু রেগে উঠলেন, 'বলছি করে দেব, আবার অত কথা কীসের? ফিরে তো এসো আগে।'

বেদে বললে, 'যদি আস!'

মনোহরবাবু তাকে ধমক দিলেন, 'তোমাকে অত কথা বলতে কে বলেছে বাছা? যাও, নীচে গিয়ে পাওয়ার লাগাও দিকিনি, নইলে—'।

বেদে অমনি একটা ছোটো সিঁড়ি দিয়ে যন্ত্রের তলায় চলে গেল।

সেজোমামা মনোহরবাবুকে বললেন, 'ফিরে আসার কলকব্জগুলো ওকে বুঝিয়ে দিয়ো, মনোহর।'

মনোহরবাবু বললেন, 'ও কি ওর বাবা-মার একমাত্র সন্তান?'

আমি বললাম, 'আরে না না, আমার দুটো ভাই, দুটো বোন।— আচ্ছা, লাইফ-মেম্বর করে দেবেন তো? কারণ বাবা হয়তো চাঁদা দেবেন না।'

মনোহরবাবু বললেন, 'তাই দেব। পকেটে কী আছে বের করে এইখানে রাখো তো দেখি।'

মেশিনের তলা থেকে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হল, তারপর কেমন শোঁ-শোঁ করতে লাগল। মনোহরবাবু একবার নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিলেন। আমি পকেট থেকে লাট্টু লেত্তি ইয়ো-ইয়ো রুমাল নীল গুলি রুমেনিয়ার দুটো ডাকটিকিট— মনাদা দিয়েছিল— আধঠোঙা নরম ঝাল ছোলা ভাজা, টর্চ, আমার বড়ো গুলতিটা আর এক কৌটো শট বের করে রাখলাম। মনোহরবাবু তো অবাক!

এসব কিচ্ছু নেবার দরকার নেই, শুধু ওজন বাড়ানো। খালি এই নোট বই আর পেনসিলটা নেবে। কী দেখবে না দেখবে, শরীরে কেমন বোধ করবে, সব টুকে রাখবে। আর এই হাতঘড়িটা নেবে, এতে সেকেন্ডের কাঁটা, তারিখের কাঁটা সব দেওয়া আছে। সব লিখবে, কখন পৌঁছোলে ইত্যাদি, ও কী হল, চলে যাচ্ছ যে।'

আমি বললাম, 'গুলতি শট না দিলে আমি যাব না।'

সেজোমামা বললেন, 'থাকগে মনোহর, এখন মনে হচ্ছে তুমি বরং আর কাউকে দেখো।'

মনোহরবাবু বললেন, 'বেশ, তা হলে আমার হাজার টাকা ফিরিয়ে দাও, আমি এক্ষুনি অন্য লোক দেখছি।'

সেজোমামা চুপ। আমি বললাম, 'তাতে কী হয়েছে সেজোমামা? আমার গুলতি দিলেই আমি যাব। অবিশ্যি বড্ড খিদে পেয়েছে, তাই আগে খানিকটা খেয়েও নেব। আর বলছি তো— একা যাব না।'

মনোহরবাবু চটে গেলেন, 'একা যাব না আবার কী? জানিস, ওই কাকাতুয়াটা আর বেড়ালটা দু-তিনবার একা গেছে, কিচ্ছু বলেনি।'

বললাম, 'চাঁদ অবধি গেছে?'

মনোহরবাবু বললেন, 'চাঁদ অবধি গেছে কি বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলেই তো তোমাকে পাঠানো হচ্ছে। নিদেন তোমার খাতা পেনসিলটা ওই যে ছোটো হাউই-মতন দেখছ, ওটাতে পুরে ফেলে দিতে পারবে তো, নিজে যদি নেহাতই— আচ্ছা সে যাকগে, এখন এই বড়িটা খাও দিকিনি, কেমন পেট ভরে যায় দেখো।'

বলে আমার মুখে কী-একটা হলদে বড়ি পুরে দিলেন, সে যে কী আশ্চর্য বড়ি আর কী বলব। খেতেই মনে হল আমি লুচি মাংস চপ কাটলেট ভেটকি-ফ্রাই চিংড়িমাছের মালাইকারি রাবড়ি কেক চকলেট ছাঁচিপান সব খাচ্ছি। একেবারে পেট ভরে গেল। সেই বড়ির শিশিটা আমার হাতে দিয়ে মনোহরবাবু বললেন, 'এই নাও এক মাসের খোরাক। একটার বেশি দুটো বড়ি কোনোদিন খেয়ো না, খেলেই পেটের অসুখ করবে, মোটা হয়ে যাবে, যন্ত্রের ভেতর আঁটবে না। এসো, এই আরাম কেদারাটাতে বসে পড়ো দিকিনি। হাওয়ার কোনো অভাব হবে না, এমন কল করেছি ভেতরে তোমার নিশ্বাসই আবার অক্সিজেন হয়ে যাবে।'

বলে সেই লম্বা চোঙার মতন যন্ত্রটার গায়েয় একটা দরজা খুলে, আমাকে একটা চমৎকার হাওয়ার গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন আর মাথার ওপর দিয়ে একটা অদ্ভুত পোশাক পরিয়ে দিয়ে কোমরে চেয়ারের সঙ্গে বগলেস এঁটে দিলেন। মুখের জায়গাটা বোধ হয় অভ্র দিয়ে তৈরি, সব দেখতে পাচ্ছিলাম। নাকের কাছে ছ্যাঁদা, নিশ্বাস নিতে পারছিলাম। তারপর দেখি সেজোমামা তাড়াতাড়ি আমার জিনিসপত্র নিজের পকেটে ভরছেন। চেঁচিয়ে বললাম, 'গুলতি দিলে না? গুলতি না দিলে যাব না বলেছি-না!'

অভ্রের মুখোশের ভেতর থেকে কথা শোনা গেল কিনা জানি না। কিন্তু সেজোমামার বোধ হয় একটু মন কেমন করছিল, কাছে এসে কী যেন বলতে লাগলেন, একবর্ণ শুনতে পেলাম না, যন্ত্রের শোঁ-শোঁ গোঁ-গোঁতে কান ঝালাপালা! দারুণ রেগে গিয়ে সেজোমামার কাছা আঁকড়ে ধরে চেঁচাতে লাগলাম, 'দাও বলছি, গুলতি না নিয়ে আমি কোথাও যাই না।'

এদিকে মনোহরবাবু বার বার ঘড়ি দেখছেন, যন্ত্রটা কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে উঠছে, অথচ আমি এমন করে সেজোমামার কাছা আঁকড়েছি যে দরজাটা এঁটে দেওয়া যাচ্ছে না। শেষটা হঠাৎ রেগেমেগে ঠেলে সেজোমামাকে সুদ্ধু ভেতরে পুরে দিয়ে মনোহরবাবু দরজা এঁটে দিলেন।

বাবা! দিব্যি ফাঁকা ছিল ভেতরটা, সেজোমামা ঢোকাতে একেবারে ঠেসাঠেসি হয়ে গেল, নড়বার-চড়বার জো রইল না। দরজা বন্ধ করাতে বাইরের শব্দ আর কানে আসছিল না, সেজোমামা চিৎকার করতে লাগলেন, 'ও মনোহর, ফেরবার কল শিখিয়ে দিলে না যে, ফিরব কী করে?'

তা কে কার কথা শোনে। ভীষণ জোরে ফুলে উঠে বোঁ করে যন্ত্রটা আকাশে উড়ে গেল। একবার মনে হল চারদিকে চোখ-ঝলসানো আলো, তারপরেই মনে হল ঘোর অন্ধকার।

যখন জ্ঞান ফিরে এল বুঝলাম চাঁদে পৌঁছে গেছি। যন্ত্রটা আর নড়ছে না চড়ছে না, কাত হয়ে পড়ে আছে, আমি বসে বসেই শুয়ে আছি, সেজোমামা আমার তলায় একটু একটু নড়ছেন-চড়ছেন। মুখ তুলে কানের কাছে বললেন, 'আমার ডান পকেটে তোর টর্চটা আছে, দেখ তো নাগাল পাস কি না।'

বুঝলাম ওঁর নিজের হাত নাড়বার জায়গা নেই। হাতড়ে হাতড়ে ঠিক পেলাম। ভয়ে ভয়ে জ্বালালাম, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যন্ত্রের ভেতরটা ভালো করে দেখলাম, ভেতরকার কলকব্জা সব ঠিক আছে, যে-যার জায়গায় আটকানো। হাত দিয়ে আমার বাঁ-পাশের জিপ ফাস্‌নার খুলে মুখোশ নামিয়ে ফেললাম।

অমনি এক ঝলকা ঠান্ডা বাতাস এসে মুখে লাগল। আঃ, চাঁদের বাতাসই আলাদা রে, এ পৃথিবীতে সে-রকমটি হয় না।

সেজোমামা বললেন, 'বেড়ে খাসা কল বানিয়েছে তো মনোহর। বলেইছিল যে নামবার সময় এতটুকু ঝাঁকানি লাগবে না, এতটুকু ভাঙবে না, টসকাবে না।'

আমি এদিকে টর্চ ঘুরিয়ে দেখি, পড়বার সময় কাত হয়ে যাওয়াতে দরজার বাইরের ছিটকিনি গেছে খুলে, দরজা এখন হাঁ!

বললাম সে-কথা সেজোমামাকে, কিন্তু আমি না সরলে তাঁর নড়বার উপায় নেই। তখন কোমরের বগলেস খুলে সেজোমামার পেটের ওপরে দুই পা রেখে এক লাফে যন্ত্র থেকে বেরিয়ে পড়া আমার কাছে কিছুই নয়। পৃথিবীতে যখন থাকতাম এরচেয়ে কত উঁচু উঁচু জায়গা থেকে লাফাতে হয়েছে। সেজোমামা শুধু একটু কোঁৎ করে উঠলেন।

বেরিয়ে বুঝলাম বোধ হয় চাঁদের কোনো একটা নিভে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির মুখের মধ্যে পড়ে গেছি। চারদিকে মনে হল নরম ঘাস। মাথার ওপর তারাও দেখতে পেলাম, আবার এক কোনা দিয়ে বোধ হয় আমাদের এই পৃথিবীটাকেই একবার একটু দেখতে পেলাম। ঠিক যেন আরেকটা চাঁদ। মনে হল আফ্রিকাটাকে যেন একটু একটু দেখতে পেলাম। তারপরেই আবার সেটা টুক করে ডুবে গেল।

তখন কানে এল যন্ত্রের ভেতর থেকে সেজোমামা মহা চেঁচামেচি লাগিয়েছেন, 'টর্চের আলো দেখা, আমিও নামব।'

অনেক কষ্টে নেমে আমার পাশে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেই বললেন, 'খিদেয় পেট জ্বলে গেল, সেই বড়ি একটা দে-না।'

টের পেলাম আমারও বেজায় খিদে পেয়েছে, দু-জনে দুটো বড়ি খেলাম, তারপর ঘাসের ওপর শুয়ে থেকে থেকে অন্ধকারটা একটু চোখ-সওয়া হয়ে এল। আমরা যে একটা বেশ বড়ো গর্তের মতো জায়গাতে শুয়ে আছি সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই, ঠিক যেন একটা বিরাট পেয়ালার মধ্যে রয়েছি। একটু একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল।

সেজোমামা বললেন, 'কী রে, উঠে একটু দেখবি না?'

বললাম, 'ভোর হোক আগে।'

সেজোমামা বললেন, 'আবার ভোর কী রে? এটা যদি চাঁদের উলটো পিঠ হয়ে থাকে তা হলে তো ভোরই হবে না।

এবারে উঠলাম। 'তাই-ই নিশ্চয় সেজোমামা। এ-পিঠটাতে তো সর্বদা আলো থাকে। দিনের বেলাও তাই দেখেছি, রাতেও দেখেছি।'

—'ফোঁস।'

তিন হাত লাফিয়ে উঠলাম। ফোঁস করল কী? তবে কি চাঁদে হিংস্র জন্তুও আছে? বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। কিন্তু স্পষ্ট শুনলাম জন্তুটা কচর-মচর করে নরম ঘাসগুলোকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সেজোমামা বললেন, 'তবে কোনো ভয় নেই। ওরা নিরামিষ খায়।'

আবার শুনলাম জোরে একটা ফোঁস ফোঁস। আমার মোটেই ভালো লাগল না। সেজোমামা কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'কী হবে রে?'

কী আবার হবে? এক নিমেষে গুলতিতে শট লাগিয়ে শব্দ লক্ষ করে দিলাম ছেড়ে। অমনি সে যে কী চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল সে আর কী বলব। একটা কেন, মনে হল এক লাখ জানোয়ার একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে! সেই চেঁচানি শুনে চাঁদের মানুষেরা জেগে উঠে সব বড়ো বড়ো মশাল নিয়ে দেখি পেয়ালার একদিকের কানা বেয়ে নেমেছে। কী হিংস্র সব চেহারা! কী ষণ্ডা, পৃথিবীর মানুষদের চেয়ে তিনগুণ জোরালো। আর সে কী গর্জন, কান ফেটে যায়।

আর এক মিনিটও অপেক্ষা করলাম না। তারা হয়তো ওই অন্ধকারে আমাদের দেখতে পেল না। পড়ি-মরি প্রাণপণ ছুটে অন্য ধারের ঘাসে ঢাকা ঢালু দেয়াল বেয়ে পিঁপড়ের মতো আমরা উঠে গেলাম। শরীরে আর এতটুকু ক্লান্তি বোধ করলাম না।

ওপরে উঠেই ছুট লাগালাম। আন্দাজে অন্ধকারের মধ্যে দু-পা না যেতেই চাঁদের পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুপ করে খানিকটা পড়েই গড়াতে লাগলাম।

সব সইতে পারি বুঝলি, শুধু ওই গড়ানিটা আমার সহ্য হয় না। তখুনি মুচ্ছো গেলাম।

আবার যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখি সেজোমামা আমার মুখে-চোখে ঠান্ডা জল ছিটোচ্ছেন। আমি নড়ে উঠতেই বললেন, 'বাপ, বেঁচে আছিস তাহলে? দাঁড়া, গাড়িটা আনি, আর এখানে নয়, চল একেবারে ভোরের গাড়িটা ধরা যাক।'

সেজোমামা গাড়ি আনতে গেলেন, আমি একটা পাথরে ঠেসান দিয়ে বসে ভাবতে লাগলাম। আস্তে আস্তে মাথাটা খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এলে বুঝলাম কুণাল মিত্তিরদের টিলার নীচেই এসে পড়েছি। সেজোমামা গাড়ি আনতেই বললাম, 'কী আশ্চর্য, না সেজোমামা? যেখান থেকে চাঁদে গেলাম আবার ঠিক সেই একই জায়গায় এসে নামলাম।'

সেজোমামা বললেন, 'আশ্চর্য বই কী। আমরা যে বেঁচে আছি সেটা আরও আশ্চর্য!'

তাই তো, যন্ত্রটা চাঁদেই পড়ে আছে। পকেট হাতড়াতে লাগলাম। সেজোমামা বললেন, 'আবার কী?'

—'কেন সব লিখে রাখতে হবে-না? ওখানে ঠান্ডা বাতাস আছে, জন্তু মানুষ সব আছে—।'

সেজোমামা বললেন, 'সে আমি মনোহরকে বলে দেব'খন। আর দেখ, এসব কথা খবরদার বাড়িতে বলবি নে।'

বাবা-মা'রা আমাদের দেখে অবাক। 'এ কী, কাল গেলে, আজই ফিরে এলে?'

সেজোমামা বললেন, 'সেখানে মহামারি লেগেছে। আমাকে আজই ফিরে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।' এদিকে আমি কাউকে কিছু বলতে পারছি না, পেট ফেঁপে মরি আর কী!

ছোটোকাকা থামলে আমরা বললাম, 'তবে কেন বললে 'একরকম বলতে গেলে' চাঁদে গিছলে? ছোটোকাকা বললেন, তার কারণ এই ঘটনার মাস চারেক বাদে মা হাতে করে সেজোমামার একটা চিঠি নিয়ে বাবাকে বললেন, 'শোনো একবার কাণ্ড। ওই যে আমাদের কুণাল মিত্তিরের ছেলে মনোহর না, সে নাকি এক উড়োজাহাজ বানিয়ে, যেখানে কুণাল মিত্তিরের গবেষণা-গোরুরা চরছিল সেখানে নামিয়ে একাকার কাণ্ড করেছে। কুণাল মিত্তির দারুণ রেগে ওকে চাকরি দিয়ে বোম্বাই পাঠিয়েছেন।'

বাবা বললেন, 'গবেষণা-গোরু আবার কী জিনিস?'

মা বললেন, 'ওমা, তাও জান না? কুণাল মিত্তির একরকম বড়ি বানিয়েছেন, তাতে সবরকম পুষ্টিকর জিনিস আছে, সে খেলেই পেট ভরে যায়। ওই টিলার মাথায় খানিকটা জায়গাকে পুকুরের মতো করে কেটে, অবিশ্যি তাতে জল নেই, সেখানে গোরুগুলো ছাড়া থাকত ওই বড়ি খেত আর মন ভালো করবার জন্য একটু একটু ঘাসও চিবুত। বাইশ সের দুধ দিত এক-একটা। ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া মনোহর সেইখানে উড়োজাহাজ নামিয়েছে। ব্যস, আর যাবে কোথা, গোরুরা সব দুধ বন্ধ করে দিয়েছে। কুণাল মিত্তির রেগে টং! ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়ে, এখন বলে নাকি ছেলের কোনো দোষ নেই, চমৎকার উড়োজাহাজ করেছে, কিন্তু পাড়ার কয়েকটা দুষ্টু লোক মিলেই নাকি ওর মাথাটা খেল। শুনলে একবার কথা!'

আমি আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে গিয়ে গুলতিটা বের করে কাগদের মারতে লাগলাম।

—'হ্যাঁ রে, তোরা এখনও বসে রয়েছিস যে, আমাকে কি বইটা শেষ করতে দিবি না?' এই বলে ছোটোকাকা আবার পা মেলে দিয়ে বই পড়তে লাগলেন।

পেয়ারা গাছের নীচে

বুড়ো দাদু আর মনুয়া দিনভর পেয়ারা গাছতলায় বসে থাকে। শীত এসে যায়, পেয়ারা গাছের পাতা বড়ো কম, ডালের মাঝখান দিয়ে রোদ এসে ওদের গায়ে পড়ে, ডালপালার আঁকাবাঁকা ছায়া ওদের গায়ে পড়ে। সেই ছায়ার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, ওপর দিকে চেয়ে মনুয়া দেখে আকাশের নীল গায়েও ওইরকম ডালপালা সাদা রং দিয়ে আঁকা।

মনুয়া একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'বুড়ো দাদু, কাল আমার জন্মদিন, আমার বন্ধু কাঁকরের তাই নেমন্তন্ন।'

বুড়ো দাদু নীল আকাশ যেখানে নীল বনের পেছনে ডুবে গেছে, সেদিকে চেয়ে বলেন, 'কাল আমারও জন্মদিন, আমার বন্ধুদেরও নেমন্তন্ন করতে হবে।'

মনুয়া বলে, 'কারা তোমার বন্ধুরা, বুড়ো দাদু? তাদের চিঠি দিতে হবে-না? মা কাল কিশমিশ দিয়ে পায়েস রাঁধবে।'

বুড়ো দাদু আরাম কেদারার তলা থেকে ছোট্ট টিনের হাতবাক্স বের করে, কাগজপত্র ঘেঁটে বলেন, 'কী জানি, তাদের নাম তো মনে পড়ছে না। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি যে কোপাই নদীতে চান করতে যেতুম, তাদের না বললে যে তারা মনে দুঃখ পাবে।'

মনুয়া উঠে এসে বলে, 'দাও তো দেখি তোমার হাতবাক্স, আমি খুঁজে দেখি তাদের নাম ঠিকানা পাই কি না।'

কিন্তু বুড়ো দাদু কিছুতেই বাক্স দেবেন না। বলেন, 'না রে মনুয়া, তোর বাবাকে, নাকি তার বাবাকে কাকে যেন একবার দিয়েছিলুম সে ঘেঁটেঘুঁটে তছনছ করে দেছ্‌ল। পরে রসিদ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তুই বরং অন্য কোথাও খুঁজে দেখিস্।'

'তাহলে মাকে ক-জনার জন্যে পায়েস রাঁধতে বলব, বুড়ো দাদু?'

—'বল গে এই পাঁচজনার জন্যে।—না রে, দাঁড়া দাঁড়া, যে আমার নতুন চটি কোপাইয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল তাকে বলে কাজ নেই। তার নষ্টামির আর শেষ নেই। কী জানি তোদের এসব ফুলগাছটাছ যদি ছিঁড়ে মাড়িয়ে একাকার করে। ওকে বাদ দিলেই ভালো।'

—'বেশ তাহলে বলি চার জন?'

—'না রে দাঁড়া, দাঁড়া। ওই যার কটা চোখ, সে ভারি ঝগড়ুটি রে মনুয়া। শেষটা যদি তোর বন্ধু কাঁকরের সঙ্গে মারপিট করে? ওকেও না বলাই ভালো।'

—'তবে কি তিন জনকে বলা হবে বুড়ো দাদু?'

বুড়ো দাদু অবাক হয়ে বলেন, 'তিন জন আবার কোথায় পেলি মনুয়া? গয়লাবাড়ির ওপারে যে থাকে, গয়লাদের কাছ থেকে চুরি করে সর মাখন খেয়ে খেয়ে, তার যে শরীরের আর কিছু নেই। অত পায়েস তার সইবে কেন? ওর নামটাও কেটে দে।'

মনুয়া বললে, 'তাহলে আমার বন্ধু কাঁকর আর কাঁকরের ছোটো ভাই উদো আসবে। আর তোমার বন্ধু দু-জন তো? যাই মাকে বলে আসি গে।'

বুড়ো দাদু তাই শুনে মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। 'কী জ্বালা! অত তাড়াটা তোর কীসের শুনি? ওই দু-জনের এক জনের মুখে সারাক্ষণ মন্দ কথা লেগেই আছে, সেসব শুনে যদি তোরা শিখে ফেলিস? থাক, ওকে না বলাই ভালো।'

মনুয়া বুড়ো দাদুর কাছে ঘেঁষে এসে বলে, 'তবে কি মোটে এক জনকে বলব?'

বুড়ো দাদু, এদিকে-ওদিকে বাগানের চারদিকে, দূরে পাকড়াশিদের বাঁশঝাড়ের দিকে আমতলির পথের দিকে চেয়ে বলেন, 'আবার একজন কোথায় পেলি রে মনুয়া? আমাকে সুদ্ধু নিয়ে বলেছিলুম পাঁচ জন।'

মনুয়া বুড়ো দাদুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে, 'তবে কি তোমার বন্ধুরা কেউ আসবে না?'

বুড়ো দাদু শুনে অবাক হন।

—'কেউ আসবে না কীরে? ওরা ক-জনাই শুধু আসবে না, আর তো সবাই থাকবে। কাঁকর, কাঁকরের ভাই উদো, তুই, তোর মা বাবা, কাকা, পিসি, তাদের বাবা আর ভুলো। ভুলোকে ভুলিস নে যেন নেড়িকুত্তো হলে কী হবে, কী গায়ের জোর ভুলোর। ও হয়তো একটু বেশিই খাবে। কিন্তু—'

মনুয়া বুড়ো দাদুর পায়ে হাত বুলিয়ে বলে, 'কিন্তু কী বুড়ো দাদু।'

—'আমি তোকে কী দেব? দে তো দেখি আমার হাতবাক্সটা। বল কী চাস্? গয়না চাস?'

—'গয়না তুমি কোথায় পাবে বুড়ো দাদু?'

—'কেন? আমার ঠাকুমার কত গয়না ছিল! ডাকাতদের সর্দার ছিল আমার ঠাকুমার বাবা। তার ভয়ে এ-অঞ্চলে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। সন্ধ্যের পর ভয়ে কেউ পথে বেরুত না। বেরুলে তাদের মেরে কেটে, গয়নাগাটি যা ছিল কেড়েকুড়ে,— ও কী মনুয়া মুখ ঢাকছিস কেন? আচ্ছা, আচ্ছা, গয়নাগাটি না-ই নিলি। তা ছাড়া সেসব নেইও। মোহর নিবি? থোলো থোলো সোনার মোহর একটাও ডাকাতি করে পাওয়া নয়। রাজা ছিল রে আমার ঠাকুরদা। ওদের বাড়িতে সবাই দুধে চান করত, সোনার খাটে বসে রুপোর খাটে পা রাখত, তকমা-পরা দাস-দাসীরা সোনা-বাঁধানো চামর দোলাত।'

মনুয়া বললে, 'কোথায় পেত থোলো থোলো সোনার মোহর ওরা?'

বুড়ো দাদু হেসে বললেন, 'ওমা তাও জানিস নে বুঝি? প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হত যে, না দিয়ে সব যাবে কোথা! ধান কেটে, ঘর জ্বালিয়ে—'

—ও কী মনুয়া, কাঁদছিস নাকি? আচ্ছা মোহর না-ই নিলি, সেসব হয়তো খরচও হয়ে গেছে অ্যাদ্দিনে। তুই বরং এই মোটা কাচের কাগজ চাপাটা নে।' বুড়ো দাদু মোটা কাচের কাগজ চাপা উঁচু করে তুলে ধরেন। বুড়ো দাদুর পায়ের কাছে মাদুরে শুয়ে মনুয়া সেই কাচের মধ্যে দিয়ে ঘন নীল আকাশ দেখতে পায়। কাচের ওপর রোদ পড়ে; ধার দিয়ে রামধনুর রং ছিটোয়। রামধনুর রং এসে বুড়ো দাদুর গায়ে, মনুয়ার গায়ে বেগনি, নীল, কমলা, লাল রঙের আঁকিবুকি কাটে। পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে। পেয়ারা গাছের আঁকাবাঁকা ডালপালার ছায়া ওদের গায়ে এসে পড়ে।

মা এসে বাটি করে ওদের জন্যে গরম দুধ, পাঁউরুটি আর নরম নরম লাল চিনি দিয়ে যান। বলেন, 'ও মনুয়া, কাল তোর জন্মদিনে কাঁকরদের নেমন্তন্ন করে আসিস।'

মনুয়া বলে, 'কাল বুড়ো দাদুরও জন্মদিন। বুড়ো দাদুও কাঁকরদের নেমন্তন্ন করবে।'

সেইখানে

আমার মেজোদাদামশাই কখনো কখনো ডেকে বলতেন, 'ও রে, টুনু মিনু নেগো ধেলো ইলু বিলু মন্টু, শোন। পরিদের দেশে গেছিস কখনো?'

শুনে আমরা হেসেই খুন। পরিদের দেশ আবার হয় নাকি? ও তো ঠাকুমাদের বানানো গল্প!

মেজোদাদামশাই বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'তবে কি আমার ঠাকুরদার বাড়ির চিলেকোঠার মস্ত সিন্দুকটাও ঠাকুমাদের বানানো গল্প বলতে চাস? যাঃ, তোদের আর কোনো কথাই বলব না।'

আমরা অমনি তাঁকে ঘিরে ধরলাম, 'না মেজোদাদামশাই, না। বলো-না, তোমার ঠাকুরদার বাড়ির চিলেকোঠার সিন্দুকের গল্প।'

মেজোদাদামশাইও তো সেই চান। বলতে লাগলেন, 'শোন তবে— ঠাকুরদার বাড়ির চিলেকোঠায় ছিল কার হাতে কবেকার তৈরি একটা কাঠের সিন্দুক। এক মানুষ উঁচু, আলমারির মতো দাঁড় করানো, কাঁঠাল কাঠের তৈরি সেটা। পাল্লার ওপর তেল-সিঁদুর দিয়ে লাল রঙের লক্ষ্মীঠাকুরুনের প্যাঁচা আঁকা। তার রং এখন জ্বলে গিয়েছে, তারই নীচে সোনালি রঙের একটা দরজা আঁকা। তারই মাঝখানে আবার ছোট্ট একটা চাবির ছ্যাঁদাও আঁকা রয়েছে।

যখন তোদের মতো ছোটো ছিলাম, রোজ সেটাকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম, আর অবাক হয়ে ভাবতাম, আঁকা ছ্যাঁদা, তার চারদিকে চাবি ঘোরানোর দাগ কেমন করে হয়!

সত্যিকার চাবির ছ্যাঁদাও ছিল একটা, কিন্তু তাতেও কেউ চাবি ঢুকিয়ে সে সিন্দুক খুলত না, তবে আবার আঁকা ছ্যাঁদার চাবির দাগ পড়ে কী করে? ঠাকুরমাকে জিগেস করলে বলতেন, 'ষাট ষাট; চুপ, ওকথা মুখেও আনিস নে। তোর ঠাকুরদার ঠাকুরদার বাবার মানত-করা ওই সিন্দুক, ওতে কি চাবি লাগাতে আছে? মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর এক্ষুনি।'

আমি করতামও তাই, আর আড়চোখে তাকিয়ে দেখতাম আঁকা ছ্যাঁদার চারদিকে চাবি ঘোরানোর স্পষ্ট দাগ। দেখতাম, আর মনে হত তেল-সিঁদুরের প্যাঁচা বুঝি আমারই দিকে চেয়ে রয়েছে।

রোজ সন্ধ্যে না পড়তেই বাড়ির পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত পড়াতে আসতেন। তেলের আলোতে বসে অং-বং পড়া যে কী কষ্ট, সে আর তোরা কী বুঝবি! যেদিন শব্দরূপ মুখস্থ হত না, সেদিন সে কী কান-প্যাঁচানোর ধুম পড়ে যেত!

প্রায়ই এটা-ওটা ভুলে যাই, একদিন সংস্কৃত পড়া তৈরি করে রাখতেই গেছি ভুলে। সন্ধ্যে বেলায় যেই-না দূর থেকে সদরের উঠোনে পণ্ডিতমশাইয়ের খড়ম পায়ের শব্দ শুনেছি, অমনি একদৌড়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে একেবারে চিলেকোঠায়।

ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজায় খিল দিয়ে, ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে খুব হাঁপাচ্ছি। চারদিক থমথম করছে, নিঝুম চুপচাপ, শুধু নিজের বুকের ধুকপুক শুনতে পাচ্ছি, আর দূরে কোথায় একটা খোঁজ খোঁজ ধর ধর শব্দ। ভয়ে মরি, শেষটা যদি এখানে এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে? তবেই তো পুরোনো খিল খসে পড়বে। এদিক-ওদিক পালাবার পথ খুঁজছি, হঠাৎ চোখে পড়ল, কাঠের সিন্দুকের আঁকা দরজায় ছোট্ট একটা সোনালি চাবি লাগানো।

আমি তো অবাক! ছ্যাঁদায় আবার কে চাবি আঁকল! এ ঘরে তো আমি ছাড়া আর কেউ বড়ো-একটা আসে না। আস্তে আস্তে গিয়ে চাবির গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলাম। ওমা, আঁকা তো নয়, সত্যিকার চাবি! চাবিটাকে ঘোরাব কি না ভাবছি, এমন সময় সিঁড়িতে শুনি পায়ের শব্দ।

অমনি সাহস এল, দিলাম চাবি ঘুরিয়ে। ঘোরাতেই খুট করে সোনালি দরজাটা গেল খুলে! আমরা তো মুচ্ছো যাবার জোগাড়।

তারই মধ্যে কানে এল ঘরের বাইরে, দোরের হাতলে টানাটানি। আর কথাটি না বলে, চাবি ধরে টেনে, দরজাটা আবার খুলে ভেতরে সেঁদিয়ে গেলাম। তারপর সোনালি চাবিটা দিয়ে আবার ভেতর থেকে এঁটে দিলাম। দেখি সেখানে ফুট ফুট করছে আলো।

সেই আলোতে চেয়ে দেখি হাতের চাবিটাকে কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে। আরে, এই তো আমার মা-র মিনেকরা বাক্সের হারানো চাবি! ওটাকে একেবার কোথায় যে রেখেছিলাম আর মনে করতে পারিনি। আর এখানে আঁকা দরজায় দিব্যি লাগানো ছিল!

চারদিকে তাকিয়ে দেখি, আর তো আমি একা নই। কোথা থেকে দলে দলে ছেলেমেয়েরা এসে হাজির। প্রথমে ভাবলাম এরা সব অচেনা, কাছে আসতে দেখি তা তো নয়। কোন কালে কার সঙ্গে খেলা করেছি, কার সঙ্গে পড়েছি, তাদের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি, তারাই সব এখন আমাকে দেখে দৌড়ে এল, খুশিতে সবাই ডগমগ! খালি হাতে এল না কেউ, সঙ্গে করে নিয়ে এল কত ছাতা, টর্চ, রুমাল, বই, পেনসিল কাটা কল, মায় একটা ইস্কুলের ব্যাগ পর্যন্ত। সব তারা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। আমি তো লজ্জায় মরি। এত জিনিস কারো কাছ থেকে নেওয়া যায় কখনো?

তারা বলে কী, 'না, এসব তোমারই জিনিস, তুমি নিজের হাতে এ সমস্ত হারিয়েছ। এখানে-ওখানে ফেলে এসেছ, এর বাড়িতে, ওর বাড়িতে, ট্রামগাড়িতে, মেলায়, ইস্কুলে, খেলার মাঠে। দেখো দিকিনি চিনতে পার কি না, এই তোমার নাম লেখা।'

তখন আরেক বার চারিদিকে চেয়ে দেখি, আরে, এ জায়গাটাও যে আমার কত চেনা, কত দিন মনে পড়েনি এখানকার কথা! এই তো এখানকার আম গাছের তলায় ছোটোবেলায় কত খেলাই করেছি! এই দেখো, আমাদের গুলি খেলার গাব্বুটা অবধি তেমনি রয়েছে! ওই তো গাছের গায়ের ছোট্ট কোটর থেকে আমার চেনা সেই সাদা কাঠবিড়ালটা মুখ বাড়াচ্ছে, আমাকে দেখে কত খুশি। আহা, আমিই ভুলে গিয়েছিলাম, ও দেখছি আমাকে ঠিক মনে করে রেখেছে!

কোথায় এলাম, এ তো আর নতুন জায়গা নয়, এ যে সবই চেনা, এ সবই যে একসময় আমার ছিল। এদের যে ভুলে গেছি তা পর্যন্ত মনে ছিল না। কানের কাছে কে যেন বললে, 'ও ছেলে আবার পালাচ্ছে, চেরতা খেতে ভুললে তো চলবে না! এই নাও, হাঁ করো।'

চেয়ে দেখি সেই আমার কবেকার ধাইমা। আরে, ধাইমার মুখটা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলাম। ওরই কোলে চেপে কত ঘুরেছি, চুল টেনেছি, চিমটি কেটেছি, ওর গায়ে দুধ ছিটিয়েছি, ওর হাতে ভাত খেয়েছি, ওর পাশে ঘুমিয়েছি। আহা, কেমন করে ভুলে গিয়েছিলাম।

ধাইমার পায়ে পায়ে আমার ছোটোবেলাকার কত আদরের মেনি বেড়ালটাও এসে উপস্থিত। আবার ঠিক তেমনি করে পিঠ বেঁকিয়ে ম্যাও ম্যাও করতে করতে ছুটে এসে আমার পা জাপটে ধরেছে।

বেড়ালটাকে সরিয়ে দিয়ে রাঙা মাস্টারমশাই এগিয়ে এলেন, দুই বগলে তাল তাল বই, হেসে বললেন, 'কত পড়া ভুলেছ বলো দিকিনি? কত নামতা, বানান, রাজধানী, কী উৎপন্ন হয়, কত সাল তারিখ, রাজার নাম, কত যুদ্ধ, কত জয়-পরাজয়— তার হিসেব রাখো? আজও শব্দরূপ মুখস্থ করতে ভুলেছ?'

এই দেশেই তবে যত রাজ্যের ভুলে-যাওয়া জিনিসের হদিশ পাওয়া যায়! আহা, ওই তো আমার হারানো মার্বেলের ঢিবি, আম গাছের তলায় ছোটো একটা পাহাড়ের মতো হয়ে রয়েছে। ওই যে আমার ঘোড়ার-ছবি-দেওয়া টিফিন খাবার বাক্স। ক-বছর আগে চড়িভাতি করতে গিয়ে কাদের বাগানে ফেলে এসেছিলাম। যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে, এতটুকু মরচে পড়েনি।

এই কি তবে পরিদের দেশ? কী ভালো এই দেশটি। আর যে ওসব জিনিস কখনো দেখতে পাব, তা ভাবিনি।

ওই তো আমার বুড়ি দিদিমারা তিনজনেই এখানে! যখন পড়তে শিখিনি, কত পরির গল্পই-না বলেছেন আমাকে। আহা, এমন মানুষদেরও ভুলে যেতে আছে? এরা যে ডানাওয়ালা পরিদের চেয়েও অনেক, অনেক ভালো! দু-হাত বাড়িয়ে সবাইকে একসঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

গল্প থামিয়ে মেজোদাদামশাই উঠে পড়েন, 'আহা, অমন দেশ ছেড়েও লোকে আবার ফিরে আসে! ওরে, ও টুনু মিনু নেগো ধেলো ইলু বিলু মন্টু, তোরা তো নিত্য সব ভুলে যাস, চল চল আমার সঙ্গে পরির দেশে চল। সেখানে যে তোদের জন্যে আলাদিনের ভাঁড়ার ঘর খোলা রয়েছে, যাবি তো চল।

'আর দ্যাখ, আর কিছু নেবার দরকার নেই, খালি একটু টিফিন নিয়ে চল। ওখানে সবই আছে, শুধু খাবারের কোনো ব্যবস্থাই দেখলাম না, খাবার খেতে বুঝি কেউ আর ভোলে না?

'তবে আমার ছোটোবেলাকার ওই আম গাছেতে আমের গুটি দেখেছিলাম, আহা, ওই টক আম কী যে মিষ্টি লাগত সে ভুলেই গিয়েছিলাম!'

আমি

এই যেটাকে আমি কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছি, সেটাকে কি লাঠি ভেবেছ? মোটেই না। ওটা হল গিয়ে আমাদের চাকর জগুর ছাতার বাঁট। জগু ওটাকে হাঁটুর ফাঁকে গুঁজে ট্রামে চেপে বাজারে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা দুষ্টু লোক ওর মধ্যে একটা আধপোড়া বিড়ি ফেলে দিয়েছিল। তাই ছাতার কাপড়চোপড় পুড়ে একাকার। জগুর রাগ দেখে কে। বাড়ি এসে ছুড়ে ওটাকে সিঁড়ির নীচে ফেলে দিয়েছিল। আমি লোহার খোঁচাগুলো ছাড়িয়ে ওটাকে নিয়েছি।

লাঠির আগায় পুঁটলি বাঁধা দেখেছ? ওতে আমার টিফিন আছে। পিসিমার ডুলি থেকে বের করে নিয়েছি। ওরা আমাকে কেউ কিছু দেয় না, তাই নিজেই নিতে হয়।

আমার সঙ্গে সঙ্গে কালোমতন একটা কী যাচ্ছে দেখেছ? ওটা ছোট্‌কার কুকুর, পুকি। কোনো কিচ্ছু আমার নয়। খালি প্যান্টটা আর শার্টটা। জুতোটাও গণ্টুর। ওকে না বলে নিয়েছি।

কোথায় যাচ্ছি জানো? রামধনুর খোঁজে। কেন জানো? রামধনুর গোড়ার খুঁটিতে এক ঘড়া সোনা পোঁতা থাকে নাকি, তাই। সোনা দিয়ে কী করব জানো? এক-শিংওয়ালা একটা ঘোড়া কিনব। কেন কিনব বলব? ওতে চেপে দিদিমার কাছে ফিরে যাব বলে।

দিদিমার কাছে কেন যাব জানতে চাও? দিদিমা আমাকে দারুণ ভালোবাসে, তাই। আমার জন্যে নারকেল-নাড়ু বানায়, ঘুড়ি কেনে, আপেল কেনে, রাত জাগতে দেয়ে, পড়তে বলে না, কেউ বকলে রাগ করে, কেউ নালিশ করলে বুকে টেনে নেয়, ঢোল পিটিয়ে ঘুম ভাঙালে হাসে, পড়ে গিয়ে সারা গায়ে কাদা লাগলে কোলে নেয়।

আমি খুব খারাপ ছেলে, তা জানো? মা বাবা ছোটকা, পিসিমা, বড়দি, মেজদি, সব্বাই বলেছে, আমার মতো খারাপ ছেলে ওরা কোথাও দেখেনি। আমি ঘুম থেকে উঠতে চাই না, দাঁত মাজি না, পড়তে চাই না, খাতা পেন্সিল খুঁজে পাই না, বই ছিঁড়ি, স্নান করতে দেরি করি, মুখোমুখি উত্তর দিই, বড়োদের কথার অবাধ্য হই। আমার মতো দুষ্টু ছেলে হয় না। জানো, আমি না বলে ছোড়দির লজেঞ্জুষ সব খেয়ে ফেলেছিলাম, একটাও রাখিনি!

জানো, আমি ভালো করে ভাত খাই না, ফেলি, ছড়াই, রাগমাগ করি, খালিখালি কাঁচা আম খেতে চাই, বাতাসা খেতে চাই। আমি দিদিমার কাছে চলে যাচ্ছি। দিদিমা আমাকে ঝকঝকে মাজা কাঁসার গেলাসে করে জল খেতে দেয় আর হাতে একটা লালচে বাতাসা দেয়। আমি জলের মধ্যে, বাতাসাটাকে যেই ফেলি, বাতাসাটাও অমনি জল-টুস-টুস হয়ে ডুবে যায়। তক্ষুনি চোঁ চোঁ করে জলটা খেয়ে ফেলতে হয়। নইলে গুঁড়ো হয়ে যায়।

আমার দিদিমা দুপুরবেলায় কেষ্টচূড়া গাছের নীচে মাদুর পেতে, বালিশ নিয়ে আমার পাশে শুয়ে, আমাকে গল্প বলে। সব সত্যি গল্প। দিদিমার বাবা-কাকারা কেমন গোরাই নদীতে কুমির দেখেছিল, তাদের বুড়ি জেঠিমাকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আর যেই-না মাঝিরা নৌকো করে গিয়ে কুমিরের মাথায় দাঁড়ের বাড়ি মেরেছে, অমনি বুড়িকে ছেড়ে দিয়েছে। আর ওরাও নৌকোতে তুলে নিয়েছে। আর বুড়ি কেঁদে কেঁদে বলছে, বাঁচালি বাপ, বেঁচে থাক বাপ আমার আমসত্ত্ব শুকোয়নি আর আমাকে কিনা কুমিরে নিলে!

আমার দিদিমা এই সব গল্প বলে আর ছোট্ট কাগজের ঠোঙা থেকে আমার জন্যে আমসত্ত্ব বের করে দেয়। আমি চেটে চেটে খাই আর দিদিমা আঁচল দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দেয়।

ওরা বলে, বাবা-কাকারা যখন কাটোয়া গেছিল আর আমি দিদিমার কাছে দু-মাস ছিলুম, দিদিমা তখন আমার মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছে। আমার বাবা মা এইরকম বলে।

একদিন কিন্তু সত্যি সত্যি দিদিমা আর আমি মট্‌কা চিবিয়ে খেয়েছিলুম। আমরা বাঁধের ধারে গেছলুম ফেরবার সময় আর হাঁটতে পারি না। শেষটা একটা আলো ওপর বসলুম দু-জনায়। দিদিমা আমার পায়ের গুলি ধরে নেড়ে দিল, অমনি আমার সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল। তারপর সেখান দিয়ে মট্‌কাওয়ালা যাচ্ছিল, দিদিমা মট্‌কা কিনে বলল কাল বাড়ি থেকে পয়সা নিয়ে যাস্। মট্‌কাওয়ালাকে চেনে আমার দিদিমা। তারপর আমরা মট্‌কা চিবোতে চিবোতে বাড়ি চলে এলুম। এসে লুচি খেলুম। দিদিমা আমার জন্যে রোজ রাত্রে লুচি করে দিত। বলত, মাকে যেন আবার বলিসনে, সে হয়তো রোজ লুচি খেলে রাগ করবে। মাকে আমি কিচ্ছু বলিনি।

দিদিমা আমাকে বেড়াল কোলে নিয়ে শুতে দিত। পুষি আমার বালিশে মাথা রেখে আমার পাশে রোজ ঘুমোত। আর আজ দেখো-না পুষিকে আমার থালার কোনায় একটু খেতে দিয়েছিলুম বলে সে কী বকাবকি! তাই আমি আর এখানে থাকব না। রামধনু খুঁজে তার খুঁটির গোড়া থেকে সোনার ঘড়া বের করে তাই দিয়ে এক-শিংওয়ালা ঘোড়া কিনে, তাতে চেপে দিদিমার কাছে গিয়ে হাজির হবো। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে যাবে না দিদিমা? আমি জানি, ওসব ঘড়া-টড়ার গল্প, এক-শিংওয়ালা ঘোড়ার গল্প দিদিমা সব বানিয়ে বলে। তাই সত্যি করে যখন এক-শিংওয়ালা ঘোড়া চেপে হাজির হব, কেমন চমকে যাবে না দিদিমা?

বন্দুক ও ছোরা

ভাই বন্দুক,

কাল যখন গুপ্তস্থানে তোমার চিঠি পেলুম না, তখন আমার মনের অবস্থা যে কী হয়েছিল, সে আর কী বলব! তবে কি তুমি এত সহজেই ভয় খেয়ে গেলে? চিরকাল তো দেখে এসেছি যে, স্বয়ং হেড-সার পেছন ফিরে বোর্ডে কিছু লিখতে গেলেই, তুমি ভেংচি কাটতে, বগ দেখাতে, সে-সময় তো তোমার অন্য মূর্তি দেখতুম!

এমনও নয় যে, তোমার অসুখ করেছে। তাহলে আমার চিঠিটা নিলে কী করে? তা ছাড়া মামার সঙ্গে বুক ফুলিয়ে খেলার মাঠে যাওয়া হচ্ছিল, সে কি আমার চোখে পড়েনি ভেবেছ?

তোমাদের বাড়ির লোকদের ধারণা, আমার সঙ্গে মিশলে তুমি গোল্লায় যাবে। তাই তোমার মন ভোলাবার জন্যেই ওদের এসব চেষ্টা, সে কি তুমি বোঝ না?

তাহলে তোমার এও জানা উচিত যে, আমাদের বাড়ির লোকদের বিশ্বাস, তুমি একটা পাজি বদমায়েশ, তাই আমাকে ও ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে অন্য ইস্কুলে ভরতি করে দেওয়া হয়েছে।

তোমার সঙ্গে মিশলে আমি খারাপ হয়ে যাব, একথা জেনেও আমি তোমাকে ছাড়িনি; আর তুমি কি শেষ মুহূর্তে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছ নাকি? আমাদের বাড়ির লোকরা বলে, তোমার টেরি বাগানো দেখেই তোমাকে হাড়ে হাড়ে চেনা যায়। সে কথা কি তবে সত্যি?

অবিশ্যি এক হতে পারে যে, অন্য কোনো দুষ্টু লোকে আমার চিঠিখানা সরিয়েছে, তুমি সেটা পাওইনি। কিন্তু তুমি তাদের বলে না দিলে গুপ্তস্থান খুঁজে বের করা কারো পক্ষে তো সম্ভব নয়!

তোমাদের বাড়ির লোকদের চিনতে আমার বাকি নেই। ওরা যদি তোমার ওপর কোনো রকম জোর-জবরদস্তি করে তো আমাকে একটু জানালেই হয়। ওদের আমি একবার দেখে নিই! যাই হোক, আমাদের বাড়ির লোকদের চেয়ে খারাপ তো আর ওরা হতে পারে না।

এ চিঠির উত্তর তোমার দেওয়া চাই-ই। কারণ সেই তাদের ও-রকম বন্দি অবস্থায় আর বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমার অবস্থা তো সবই জান, ওদের খাবার জোগানো আমার বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠছে না। অথচ কাজ হাসিল হবার আগে মরে গেলেও তো আগাগোড়া লোকসান। ভালো চাও তো চিঠি পেয়েই গুপ্তস্থানে উত্তর রেখে দেবে। ইতি—

ছোরা।

ভাই ছোরা,

তা বললে তো চলবে না, এই সময় ওরা মরে গেলে হবে না। আমি আর ধরে আনতে পারব না বলে রাখলাম। প্রাণ হাতে নিয়ে ও-কাজ করতে হয়েছিল। আম বাগানের ও-দিকটাতে কী ঘন

কচু বন, তোমার কোনো ধারণাই নেই। আমি বলেই পেরেছিলাম। বড়োজোর আজ বাদে কাল। তারপর তো আর খাবারের দরকার হবে না, এখন আর অত বাছবিচার কীসের? তবে আশা করি ওদের একসঙ্গে রাখনি? তাহলে হিংস্র হয়ে উঠে আবার পরস্পরকে না আক্রমণ করে!

আমাদের বাড়ির লোকরা শনিবারের তিনটের শোর জন্যে বাড়িসুদ্দু সকলের টিকিট কিনেছে আর রবিবার ভোরে দল বেঁধে সোনারপুর যাওয়া হচ্ছে, সেখানে লুচি পাঁঠা রান্না হবে। আমাকে হিংসে করে আমার বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে তুমি যা ইচ্ছে বলতে পার, আমার কাঁচকলাও এসে যাবে না। তা ছাড়া ওরা যে লোক ভালো নয় সে তো আমি বরাবর জানি। গত বছর যাত্রা দেখতে যাওয়া নিয়ে কী কাণ্ড করেছিল, সে আমি আজও ভুলিনি। না বলে যাব না তো কী করে যেতাম? বললে কি ওরা মত দিত বলতে চাও? সে যাক গে, এখন একটু চুপচাপ থাকো, এদের মনের সন্দেহ ঠান্ডা হোক, তারপর আর কোনো ভাবনাই থাকবে না। ওদিকে আমিও বেশ ফ্যাসাদে পড়েছি, টাকাকড়ি না হলে তো কোনো ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না। তোমার জন্মদিনে পাওয়া টাকাগুলো এরইমধ্যে কী করে খরচ হয়ে গেল, ভেবে পেলাম না! সব টাকা আমি জোগাব, আমি কি একটা ব্যাঙ্ক নাকি? ওই যে কী নাম, ভুলে যাচ্ছি যা নিয়ে দেবতারা ঝগড়া করতেন, ইচ্ছে-গাই না কী যেন? ইতি—

বন্দুক।

পুঃ— কালকের চিঠির উত্তর দিইনি, কারণ ফুল্লরা কেবিনে মামার সঙ্গে কাটলেট খেতে যাবার দরুন সময় পাইনি।

ভাই বন্দুক,

তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে বাকি রইল না, তোমার কতদূর অধঃপতন হয়েছে। জন্মদিনের টাকা দিয়ে তো কবে সেই টিকিটের অ্যালবাম কিনেছিলুম, কোন কালে সে হারিয়েও গেছে।

আর টাকার অভাব আবার একটা কথা নাকি? আমার অনেক হাতের লেখা লিখতে হয়, নইলে টাকা রোজগার করা কী এমন শক্ত, বুঝলুম না। যাই হোক, কয়েকটা উপায় বাতলে দিচ্ছি, তাতে কিছু টাকার উপায় হবেই। যেমন (১) তেলেভাজার দোকান— কোনো মূলধন লাগে না। তোদের রান্নাঘরে ও ভাঁড়ার ঘরে সব পাবি। (২) ধারের ব্যাবসা। মামার কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে দু-টাকার জায়গায় তিন টাকা দেবে। আবার খাটাবি, হবে সাড়ে চার টাকা— তা হলেই হবে। (৩) লটারি করা। তোদের পুরোনো রেডিয়োটা লটারি করে দে, এক টাকা টিকিট। তিন দিনে দুশো টিকিট বিক্রি হবে— তার দেড়-শো দিয়ে একটা নতুন রেডিয়ো কিনবি, বাকি টাকা আমাদের। এইগুলো করে দ্যাখ, নিশ্চয়ই যথেষ্ট হবে। ইতি—

ছোরা।

পুঃ— আর দ্যাখ, দু-এক দিনের মধ্যে যা হয় করিস। ওদের মধ্যে তিন জন নড়ছে-চড়ছে না। ভাতটাত খায় না কেউ। রুটিও না।

ভাই ছোরা,

তোর আহ্লাদ দেখে অবাক হই! আমি সব করব আর উনি শুধু বুদ্ধি জোগাবেন, এ তো মজা মন্দ না! এদিকে চারদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। ওদের ভালো করে তোদের খালি গোয়ালে লুকিয়ে রেখেছিস? শব্দটব্দ করে না আশা করি? কারণ আমার খুব মনে হয় না— আমাদের পিছু নিয়েছে। জানিস তো ওর কীরকম লোভ। আমাকে এক দণ্ড ছাড়ে না, ইস্কুলে সঙ্গে যায় আসে।

গোপন জায়গার পাশ দিয়ে যাই আসি, তবু চিঠি নেওয়া একটা সমস্যা হয়ে পড়েছে। কেউ নিশ্চয় ওকে টাকা দিয়ে বশ করেছে। কারণ চিরকাল তো ওর ট্যাঁক গড়ের মাঠ বলে জানি, অথচ কাল যখন সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল, পকেট থেকে ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল। ও চান করতে বাড়ি গেলে এ-চিঠির ব্যবস্থা করব। যাই হোক, তুই কিছু ভাবিস না, কাল একটা হেস্তনেস্ত করবই। কিন্তু ভাই, মনে থাকে যেন, এবার আমাকে রাজা করতেই হবে, আমি আর ঘৃণ্য হীন পদে থাকতে রাজি নই। এত করছি শুধু ওই জন্যেই। ইতি—

বন্দুক।

ভাই বন্দুক,

গুপ্ত জায়গার কথাটা ম—কে বলতে হয়েছে, কারণ এরা আমাকে দু-দিন উপরি উপরি জোলাপ খাওয়াল, চিঠিপত্র নেওয়া আনার আর কোনো ব্যবস্থা করা গেল না। তবে ও কাউকে বলবে না বলেছে। ওর নাকি ভয় ভয় করে, যদি ধরা পড়ে, তাই। তাই ওকে কিন্তু সেনাপতি না করলে হয়তো সব ফাঁস করে দেবে। ওদিকে ওদের তো প্রায় সবার দফা শেষ। গোয়ালে আর ঢুকতেও ইচ্ছে করে না। সেই অন্যদের দিয়েই কাজ চালাতে হবে। টাকার কিছু করতে পেরেছিস নাকি? বেশি কেনবার কী দরকার? গোটা পাঁচেক হলেই তো যথেষ্ট। আমি ছোড়দাদুর পাকাচুল তুলে এক টাকা জমিয়েছি, বাকিটা কিন্তু তোকে তুলতেই হবে, নইলে সব মাটি, আর সময়ও নেই একদম। ইতি—

ছোরা।

ভাই ছোরা,

শুনে খুশি হবি, সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। শ—ই আমার শাপে বর হল। ওকেও দলে টানতে হল। বলেছি মন্ত্রী করে দেব। ওর কাছ থেকে তিন টাকা ধার নিয়ে পাঁচটা কিনেছি। আর যা যা লাগবে তোর টাকাটা দিয়েই হয়ে যাবে। আজ রাত্রে শ— নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। তুই ম—কে দিয়ে সেই অন্যদের জোগাড় করে পাঠাস আর টাকাটাও দিস। তাহলে কাল ভোরের মধ্যে সব হয়ে যাবে। শুধু তাদের বাঁচিয়ে রাখা গেল না, এই এক দুঃখ থেকে গেল। ইতি—

বন্দুক।

ভাই বন্দুক,

আমার সত্যি সত্যি সর্দিজ্বর হয়েছে। জানতুম অত জোলাপ আমার সইবে না! তার ওপর সকাল থেকে মন খারাপ, কারণ কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। ম—র দেখা নেই, সেই কাল সন্ধ্যে বেলা টাকা নিয়ে আর অন্যগুলোকে নিয়ে গেছে তো গেছেই, কাজ হাসিল হয়েছে কি না তা পর্যন্ত বুঝলুম না। সব জানাস ভাই, নইলে এই রোগশয্যা থেকে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। ইতি—

ছোরা।

ভাই গুপি,

আর গোপনতার কোনো দরকার নেই, যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। শম্ভু আর মন্টু দু-জনে মিলে রাতে নতুন খুড়োর পুকুরে পাঁচটা ছিপই কেঁচো গেঁথে ফেলে রেখেছিল। ভোরে গিয়ে দেখে পাঁচটা চার-সেরি, সাড়ে-চার-সেরি কাতলা পড়েছে। সেইগুলোকে তুলে নিয়ে চারটেকে ওরা পুজো

কমিটির চার জনার বাড়িতে নিজেদের নামে দিয়ে এসেছে আর একটা দিয়েছে নতুন খুড়োকে। এত বড়ো মিথ্যাবাদী যে, বলেছে টালিগঞ্জে গিয়ে নাকি কোন বন্ধুর পুকুর থেকে ধরেছে। তাঁরা তো সব আহ্লাদে আটখানা। মাছের গায়ে তো আর টিকিট ঝোলানো নেই যে, নতুন খুড়োর পুকুর থেকে ধরা।

নতুন খুড়ো এইমাত্র জ্যাঠামশাইকে বলে গেলেন, শম্ভু আর মন্টু নাকি পুজোর নাটকে রাজা আর শত্রু-রাজা হবে, আর তোকে আমাকে নাকি মন্ত্রী আর সেনাপতি করা হবে। সে পার্টগুলো কত ছোটো তোর মনে আছে তো ভাই? আর শম্ভু মন্টুর পেজোমি দেখলি! নতুন খুড়োর পুকুর থেকেই রাতারাতি মাছ চুরি করে— চুরি নয় তো কী ভাই?— ওকে আর ওর দলটিকে দিয়ে আমাদের পার্টগুলো বাগিয়ে নিলে। এই বয়সেই এই, আরও বড়ো হলে যে পাকা দাগি চোর হবে না, তাই-বা কে বলবে! অথচ বুদ্ধিটা হল তোর আমার! কচুবন থেকে ফড়িং ধরে এনেছিলুম আমি, নেহাত তুই বাঁচাতে পারলি না বলে কেঁচো দিয়ে ধরতে হল। কিন্তু সমস্তটা আমাদের মাথা থেকেই বেরুল, অথচ ফল ভোগ করছে ওরা দুটোতে। তোর বাবা আমাদের বাইরের ঘরে বসেছিলেন, নতুন খুড়ো তাঁকে কী বললেন জানিস? বললেন, ওই জগু গুপি দু-টি গুণধরকে আলাদা করে দিয়ে খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন, দাদা। শম্ভু মন্টুর মতো ভালো ছেলেদের সঙ্গে মিশলে এখনও ওদের সুমতি হতে পারে। নিজের পুকুরের মাছ উপহার পেয়েই একেবারে গলে জল। ওই বুড়োকে কী করে জব্দ করা যায় এখন তাই ভাবছি। সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে, গুপ্ত জায়গাটা ওরা জেনে গেল বলে। নইলে কচু বনের পেছনের ভাঙা দেয়ালের আলগা ইট সরিয়ে তার পেছনে চিঠি রেখে, আবার ইট বন্ধ করার কথা তোর ছাড়া আর কার মাথা থেকে বেরুত ভাই?

ঠিক করেছি, তোর জ্বর হয়েছে বলে বাবা জ্যাঠামশাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে একবার তোকে দেখতে যাব। তখন বাকি কথা হবে।

ইতি—
তোর প্রাণের বন্ধু
জগু।